## কোয়ান্টাম মেথড-৫

# পবিত্র হাদীস বিকৃতির অভিনব কৌশল

মুফতী শরীফুল আ'জম

পবিত্র কুরআন যেমন ঐশীবাণী পবিত্র হাদীসও তেমনি ঐশী বাণীর একটি প্রকার। তফাত শুধু এটুকু যে, কুরআনের শব্দ ও মর্ম উভয়টি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ আর হাদীসের মর্ম আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আর শব্দসমূহ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র জবান থেকে নিঃসৃত। তাই কুরআনের মাঝে বিকৃতি সাধন যেমন জঘণ্য, হাদীসের বেলায়ও বিকৃতি বা বানোয়াটের আশ্রয় নেয়া হলে তার পরিণতি খুব ভয়াবহ। এ ব্যাপারে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (مشكوة ٢٣) "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন নিজের অবস্থান জাহান্নামে করে নেয়।" (মেশকাত ২৩)

সাহাবায়ে কেরাম থেকে আরম্ভ করে যুগে যুগে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে সর্বদা এই ভীতিই কাজ করত। ফলে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরা যারপরনাই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) পাঁচ শত হাদীসের একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন। একবার হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) তাঁকে সারা রাত বিছানায় ছটফট করতে দেখলেন। সকাল বেলা তিনি বললেন যে, হাদীসের যে পাণ্ডুলিপিটি তোমার কাছে রেখেছিলাম তা নিয়ে আসো। পিতার কথা মতো পাণ্ডুলিপি সামনে উপস্থিত করলে তিনি সেটিকে পুড়িয়ে ফেললেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হাদীসগুলো পুড়িয়ে ফেলার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমার ভয় হয় যে, আমার মৃত্যুর পর এ পাণ্ডুলিপিটি আমার কাছে রয়ে যাবে। যাতে বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে শোনা বর্ণনা ও স্থান পেয়েছে। যেগুলোকে আমি নির্ভরযোগ্য মনে করেছিলাম, অথচ বাস্তবে হয়ত তা গ্রহণযোগ্য নয়। হতে পারে সেখানে কোনো ধরনের গড়বড় রয়েছে। যার দায়দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাবে। কাজেই এই গোনাহের ভাগিদার হওয়ার ভয়ে তা জ্বালিয়ে ফেললাম। .....

হযরত আলী (রা.) বলেন, اذا حدثتكم عن رسول الله ﷺ حديثا فوالله لان اخر من السماء احب الى من ان اكذب عليه "আল্লাহর কসম আমি যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সূত্রে কোনো হাদীস তোমাদের কাছে বর্ণনা করি তখন তার ওপর মিথ্যারোপ করার চেয়ে আসমান থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ আমার কাছে প্রিয় মনে হয়।" (বুখারী ২/১০২৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) যিনি নবীজি (সা.)-এর বিশিষ্ট খাদেম ছিলেন এবং ঐ সকল সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা ফতাওয়া প্রদান করতেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর সতর্কতা ছিল উল্লেখযোগ্য। হযরত আমর ইবনে মাইমুন (রা.) বলেন, আমি এক বছর পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার রাতে ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মজলিসে হাজির হতাম। আমি কখনো তাকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি নিসবত করে কথা বলতে শুনিনি। একদা হাদীস বলতে গিয়ে তাঁর যবান থেকে "হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন" এ বাক্য বেরিয়ে আসার সাথে সাথে তাঁর শরীরে কম্পন শুরু হয়ে যায়। নয়ন অশ্রুশিক্ত হয়ে ওঠে। কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যায় এবং রগগুলো ফুলে যায় আর সাথে সাথে তিনি বলে ওঠেন ইনশাআল্লাহ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমনই ইরশাদ করেছেন, বা এর কাছাকাছি বা কিছু কম বেশি হতে পারে। (মুসনাদে আহমদ) এই হলো হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের সতর্কতার নমুনা।

হাদীসের প্রতিটি শব্দ কী ধরনের সতর্কতার সাথে হেফাজত করা হয়েছে তার প্রমাণ হাদীস গ্রন্থের পাতায় পাতায় বিদ্যমান। বিশুদ্ধ রূপে হাদীস ভাণ্ডারকে সংরক্ষণ করার জন্য উম্মতের বিশাল এক কাফেলা নিজেদের জীবনের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন। শুধুমাত্র একটি হাদীসের জন্য শতশত মাইল পথ পাড়ি দেয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাঁরা। সব কষ্ট ক্লেশ বরদাশত করেছেন কিন্তু হাদীসের মাঝে একটি শব্দ পরিবর্তনকে মেনে নেননি। বরং সতর্কতা অবলম্বনের বিরল দৃষ্টান্ত কায়েম করে দেখিয়েছেন। এখানে উদাহরণ স্বরূপ একটি হাদীস তুলে ধরা হলো।

عن ابن عمرؓ قال قال رسول الله ﷺ ان الله لايجمع امتى او قال امة محمد على ضلالة ـــ(مشكوة :٣٠)

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতকে অথবা বলেছেন উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে ভ্রষ্টতার ওপর একমত করবেন না...।" (মিশকাত পৃষ্ঠা ৩০) এখানে বর্ণনাকারীর সতর্কতা লক্ষণীয়। যদিও "আমার উম্মত" আর

"উম্মতে মুহাম্মদিয়া" একই কথা কিন্তু রাসূলের শব্দ কোনটি তা নিশ্চিত না হওয়ায় সতর্কতামূলক উভয়টি উল্লেখ করেছেন।

এটা ইসলামের একটি গৌরব যে, দেড় হাজার বছর পার হওয়া সত্ত্বেও নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীসমূহ হুবহু শব্দে শব্দে সংরক্ষিত হয়ে আছে। যেখানে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু কি তাই? হাদীসের বর্ণনাকারীদের জীবনী পর্যন্ত সবিস্তারে লিপিবদ্ধ আছে। এবং তাদের সভাব চরিত্র ও গ্রহণযোগ্যতাসহ যাবতীয় তথ্য এমনভাবে সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, এর ওপর বিশাল কিতাব ভাণ্ডার রচিত হয়েছে। সব মিলিয়ে এমন দৃঢ় ও মজবুত অবস্থান তৈরি হয়ছে যে, শত চেষ্টা করেও কেউ হাদীসের মাঝে কোনো রদবদল, শব্দ পরিবর্তন বা অর্থ পরিবর্তনে সক্ষম হয়নি এবং হবে না। যা বর্তমান যুগে ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম হওয়ার একটি অলৌকিক প্রমাণ।

নব্বই ভাগ মুসলমানের এই সোনার বাংলাদেশে সর্বস্তরের মানুষের মাঝেই রয়েছে ইসলামের প্রতি গভীর আকর্ষণ, মহব্বত ও ভালোবাসা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রতি রয়েছে তাদের বিপুল ভক্তি-শ্রদ্ধা। কুরআন-হাদীসের ভাষা আরবী ভাষায় লেখা কোনো কাগজ ও কেউ অজু ছাড়া স্পর্শ করতে চায় না। কুরআন-হাদীসের কথা শোনালে যে কারো মন না গলে পারে না। কুরআন-হাদীসের প্রতি মুসলমানদের এই মহববত ও দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে এ দেশে কালের আবর্তনের সাথে সাথে বহু বাতেল ফেরকা সমাজে তাদের অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। কুরআন-হাদীসের প্রলেপ লাগিয়ে সব ধরনের তেতো সফলভাবে এ দেশের সরলমনা ইসলামপ্রিয় জনগণকে গলাধঃকরণ করাতে পেরেছে। অতএব, ইতিহাস স্বাক্ষী ইসলামের দুশমনেরা সর্বযুগে কুরআন-হাদীসকে গলায় বেঁধেই মুসলমানদের গোমরাহ করার পথ নিষ্কণ্টক করেছে।

কোয়ান্টামের মেধাবী কর্ণধারগণ এ দেশের মুসলমানদের ধর্মীয় মনোভাব সম্পর্কে নিশ্চয়ই ওয়াকিফহাল রয়েছেন। মানুষের ব্রেন ও মাইন্ড নিয়ে তাদের গবেষণা একটু বেশিই বলা চলে। তাই এ সুযোগকে তারা হাতছাড়া করবেনই বা কেন? কুরআন কণিকা ও হাদীস কণিকা নামে পুস্তিকা রচনা করে কোয়ান্টাম ধর্মপ্রাণ জনগণকে নতুন একটি মতাদর্শের দিকে আকৃষ্ট করছে। কুরআন-হাদীসের মর্মবাণী প্রচারের নামে এর মূল শিক্ষাকে কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে ঘষামাজা করে কিছু আয়াত ও হাদীসের অনুবাদ পেশ করা হয়েছে। ইসলামকে সকল ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল রূপে তুলে ধরা হয়েছে। সকল ধর্মই যেন ইসলামে স্বীকৃত এমন একটি মতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই চিন্তাধারাটি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন শব্দের অর্থ পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতে তাদের একটুও হাত কাপেনি। উল্টো বীরত্বের সাথে এগুলো বাধাহীনভাবে প্রচার করে যাচ্ছে তারা। বিশেষ করে شهـادت শাহাদাত, عـلـم ইলম, مسلم মুসলিম, مومن মুমিন, دين দ্বীন, احسان ইহসান ইত্যাদি শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাকে পরিবর্তন করে ইসলাম ধর্মকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। আবার কোনো কোনো হাদীসকে আংশিকভাবে উল্লেখ করেছে। কখনো এমন ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হাদীস এনেছে, যার ব্যাখ্যা ছাড়া মর্ম অনুধাবন অসম্ভব। যুগ যুগ ধরে বিশুদ্ধ রূপে সংরক্ষিত হাদীস ভাণ্ডার যেন তাদের কাছে ছেলেখেলা। হাদীস বিকৃতির ব্যাপারে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ধমক তাদের অন্তরে সামান্য রেখাপাত করেছে বলেও মনে হয় না। আসুন এবার দেখা যাক কী তেতো মেশানো হয়েছে কোয়ান্টাম কণিকায়। এ পর্যায়ে হাদীস কণিকা অধ্যায় থেকে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হবে। প্রথমে ওই সকল হাদীসের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা উল্লেখ করে কোয়ান্টামের বিকৃত মর্মবাণী তুলে ধরা হবে।

এক.

عـن ابـن عـمرؓ قال قال رسول الله ﷺ بـنـى الاسـلام على خمس شهادة ان لا الـه الا الـلـه وان محمداعبده ورسوله واقـام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (متفق عليه)

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল..."

উক্ত হাদীসের মাঝে ইসলামের পঞ্চভিত্তির প্রথম যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান। আর কারো ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টি মুখের সাথে সম্পর্ক রাখে অন্তরের সাথে নয়। মুসলমান হতে হলে এ ব্যাপারে অন্তরের বিশ্বাসের পাশাপাশি মুখেও স্বীকার করতে হবে এবং সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। যদি অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস থাকে আর মুখে এর সাক্ষ্য প্রদান করা না হয় তবে

সে দুনিয়াতে মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না। বরং এ ধরনের বাহ্যিক সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিরত থাকা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। এক হাদীসে এসেছে–

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রাসূল" মানুষেরা এ কথার সাক্ষ্য প্রদানের আগ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম) অতএব মুসলমান হতে হলে এ কথার মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান আবশ্যক। শুধু অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

এবার দেখা যাক কোয়ান্টামের ছলচাতুরীর কয়েকটি নমুনা।

**এক.** কোয়ান্টাম কণিকায় উক্ত হাদীসটি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। "ইসলামের মূল ভিত্তি ৫টি। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রাসূল বলে বিশ্বাস করা....।" (কোয়ান্টাম কণিকা পৃষ্ঠা ৩১৫)

এখানে হাদীসের শব্দ شهادة এর অর্থ সাক্ষ্য প্রদান এর স্থলে 'বিশ্বাস' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস বিকৃতির এটি একটি জঘণ্যতম দৃষ্টান্ত। বিষয়টি ইসলামের মূল ভিত্তি-সংক্রান্ত হওয়ায় এর গভীরতার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কোয়ান্টামের অনুবাদ অনুযায়ী আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান ছাড়াও মুসলমান হতে পারে। ইসলামের ভিত রচিত হতে পারে বিধায় অন্তরের বিশ্বাস ঠিক রেখে সকল ধর্মের লোককে খুশি রাখার জন্য শাহাদাতকে গোপন রেখে সকলের সাথে তাল মেলানোর পথ সুগম হয়ে গেল। অথচ সাক্ষ্য প্রদান আর বিশ্বাস স্থাপন এ দুটি কখনোই সমার্থবোধক হতে পারে না।

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর প্রাণপ্রিয় চাচাজান আবু তালিবের নবীজির ওপর আন্তরিক বিশ্বাসের কোনো ঘাটতি ছিল না। কিন্তু শুধু মৌখিক সাক্ষ্য প্রদানে অপারগ হওয়ায় তিনি ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে পারেননি। এ সাক্ষ্য আদায়ের জন্য মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। এর মাধ্যমে বিষয়টির গুরুত্ব সহজে অনুধাবন করা যায়। তাই কোয়ান্টামের মর্মবাণী নামে এই অনুবাদ হাদীসের মর্মার্থ বিকৃতির একটি অপকৌশল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

**দুই.**

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

طلب العلم فريضة على كل مسلم

"দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।"(মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৪)

এখানে দ্বীনি ইলম শিক্ষাকে ফরজ বা বাধ্যতামূলক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পার্থিব জ্ঞান অর্জন ইসলামে নিষিদ্ধ নয়, তবে তা প্রত্যেকের জন্য ফরজ করা হয়নি। দুনিয়াবী শিক্ষা যে যতটুকু লাভ করুক বা না করুক তবে দ্বীনি ইলম অবশ্যই প্রত্যেক মুসলমানকে প্রয়োজন পরিমাণ শিখতে হবে। এই ইলমের মাঝে ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাস, নামায ও রোযা ইত্যাদি ইবাদত বন্দেগী সংক্রান্ত ইলম অন্তর্ভুক্ত। কোয়ান্টাম কণিকায় এই হাদীসকে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে– "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক বিশ্বাসী নর-নারীর জন্য ফরজ।" (কোয়ান্টাম কণিকা-পৃষ্ঠা ৩১৮)

হাদীসে উল্লেখিত (علم) ইলম শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে 'জ্ঞান'। অথচ ইলম ও জ্ঞানের অর্থের মাঝে বিস্তর ব্যবধান। (মাসিক আল-আবরারের জুলাই ২০১২ সংখ্যায় এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে তা দেখা যেতে পারে।)

এই হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনি ইলম শিক্ষাকে ফরজ তথা বাধ্যতামূলক করা। পক্ষান্তরে কোয়ান্টামের অনুবাদ দ্বারা সর্বপ্রকার পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা হাদীসের মাঝে বিকৃতি সাধনের একটি রূপ।

দ্বিতীয়ত : হাদীসে বলা হয়েছে (على كل مسلم) "প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ"। এখানে বিশ্বাসী বা নর-নারী অনুবাদ করার মাঝে কোয়ান্টামের মতলব কী? বিশ্বাস বা বিশ্বাসী শব্দের যে অর্থ কোয়ান্টামের নিজস্ব পরিভাষায় ব্যবহার হয়ে থাকে তাতে মুমিন -মুসলমান হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। যে কোনো ধর্মের লোকই এই বিশেষ অর্থে বিশ্বাসী বলে পরিচিত হতে পারে। বিশ্বাস বলতে তারা 'মুক্ত বিশ্বাস'কে বোঝায়। "আমি পারি আমি পারব" এ কথাটিই মূলত কোয়ান্টামের মুক্ত বিশ্বাসের বক্তব্য বা শিক্ষা। এমন বিশ্বাসে বিশ্বাসী হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা মুসলিম যে কেউ হতে পারে। মুক্ত বিশ্বাস ভ্রান্ত বিশ্বাস শিরোনামে ইতিপূর্বে মাসিক আল-আবরারে বিস্তারিত লেখা হয়েছে। প্রয়োজনে তা দেখা যেতে পারে।

কোয়ান্টামের এই বিকৃত অনুবাদে হাদীসে বর্ণিত মুসলিম শব্দের আর কোনো বৈশিষ্ট্য বাকি থাকেনি। বরং মুসলিম ও অমুসলিমের ভেদাভেদটিই

দূর হয়ে গেছে। আসলে কোয়ান্টামের মূল টার্গেটও তাই। ইসলামকে অন্য ধর্মের সাথে গুলিয়ে ফেলাই মনে হচ্ছে তাদের একমাত্র লক্ষ্য। অথচ ইসলামকে অন্যসব ধর্মের ওপর বিজিত করতে আল্লাহ তা'আলা শেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে প্রেরণ করেছেন বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

"তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের ওপর প্রবল করে দেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (সূরা সাফ- আয়াত ৯)

তাই সকল ধর্মের লোককে খুশি করতেই কোয়ান্টাম হাদীসে বর্ণিত মুসলিম শব্দের অর্থ মুসলমান না করে বিশ্বাসী করেছে কি না তা ভেবে দেখা দরকার।

**তিন.**

عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله ﷺ تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ (متفق عليه)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "কোনো রমণীকে চার কারণে বিবাহ করা হয়ে থাকে। মাল, বংশ, রূপ ও দ্বীন। অতএব দ্বীনের বিষয়টি প্রাধান্য দাও, তুমি সফলকাম হবে।" (বুখারী মুসলিম)

উক্ত হাদীসে দ্বীনদার মেয়েকে বিবাহ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। দ্বীনদারী বলতে ইসলামের সকল হুকুম-আহকাম পালন করাকে বোঝায়। আর নারীদের বেলায় বিশেষ করে শরয়ী পর্দা পালনের বিষয়টি সর্বাগ্রে আলোচনায় আসে। তাই দ্বীনদার রমণী বলতে পর্দানশীন, মুমিন, মুত্তাকি রমণী উদ্দেশ্য।

এবার আসা যাক কোয়ান্টাম কণিকায়। উক্ত হাদীসটিকে সেখানে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– "কোনো নারীকে চারটি যোগ্যতার জন্য বিয়ে করা যায়। ১. সম্পদ ২. বংশমর্যাদা ৩. রূপ ৪. গুণ। এমন নারী খোঁজ করো, যার গুণ আছে। অন্য বিবেচনায় বিয়ে করলে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (কোয়ান্টাম কণিকা পৃষ্ঠা ৩১৮) হাদীসে উল্লেখিত (ديـــن) দ্বীন শব্দের অনুবাদ কৌশলগত কারণে পরিবর্তন করে 'গুণ' বলা হয়েছে। নারীর গুণ বলতে কী বোঝায়? বুদ্ধিমতী, মিষ্টভাষী, মিশুক, সদাচারী ও সংসারী ইত্যাদি বিভিন্ন মানবীয় গুণ, যা প্রত্যেকের যোগ্যতা ও চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু এ সকল গুণের জন্য মুসলমান হওয়া বা পর্দানশীন হওয়া জরুরি নয়। একজন অমুসলিম রমণীও এ সকল গুণের অধিকারীনী হতে পারেন। কোয়ান্টামের অনুবাদ অনুযায়ী মুসলিম/অমুসলিম নারীকে বিবাহ করার মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই, শুধু গুণবতী হলেই চলবে। অথচ উক্ত হাদীসের মূল শিক্ষাই হলো বিবাহের ক্ষেত্রে মুমিন, মুত্তাকি ও দ্বীনদার রমণীকে প্রাধান্য দেওয়া। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা دين দ্বীন শব্দের অর্থ বিকৃতির মাধ্যমে কোয়ান্টাম ইসলামের একটি মৌলিক বিধানকেই শিথিল করে দিয়েছে। সকল ধর্মকে সমন্বয়ের বিকৃত মানসিকতা চরিতার্থ করতেই তারা এমন অপব্যাখ্যা দিয়ে চলছে। আবার হাদীসের মর্মার্থ পরিবর্তনের নাম দিয়েছে মর্মবাণী, যা চরম হাস্যকরও বটে।

**চার.**

প্রসিদ্ধ হাদীসে জিব্রাঈলের শেষ অংশে احســان ইহসানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ان تعبد الله كانك تراه، فان لـم تكن تراه فانه يراك "এমনভাবে তুমি আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছো। আর তুমি যদি তাঁকে দেখতে নাও পাও তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন.....।" (বুখারী)

এখানে সদাসর্বদা সকল ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহকে হাজির-নাজির মনে করার কথা বলা হয়েছে। (মিরকাত ১/১২০)

অন্তরের মাঝে এমন অবস্থা ও ভাব সৃষ্টি হওয়াই প্রকৃত 'ইহসান'। যা বিশেষ কোনো ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।

কোয়ান্টাম কণিকায় এই হাদীসের অনুবাদ পরিবর্তন করে বলা হয়েছে "এমনভাবে নামায পড়ো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো...।" (কোয়ান্টাম কণিকা ৩১৫)

অথচ হাদীসটিতে নামায শব্দের কোনো উল্লেখ নেই। বরং হাদীসটি ব্যাপক, প্রত্যেক ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একে নামায, রোযা বা অন্য কোনো বিশেষ ইবাদতের সাথে নির্দিষ্ট করা ভুল।

**পাঁচ.**

মহিলাদের মসজিদে গমনের বিষয়টি নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুগে কিছুটা শিথিল ছিল। সে সময় আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন নতুন নতুন বিধিবিধান জারি হতো, যা মসজিদে বসে তা'লীম দেওয়া হতো। নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই মজলিসে মহিলা সাহাবীগণও আগ্রহের সাথে শরীক থাকতেন। এ হিসেবে মহিলাদের মসজিদে নববীতে হাজির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হলেও বারবার তাদেরকে নিজ গৃহে নামায আদায়ের তাকিদ দেওয়া হতো। শুধু তা-ই নয়, নিজ গৃহের নামায মসজিদে নববীতে

হাজির হয়ে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইমামতিতে নামায আদায় অপেক্ষা শ্রেয় ও সওয়াবের কাজ বলেও ঘোষণা করা হতো। অসংখ্য হাদীস যার প্রমাণ বহন করে। উল্লেখ থাকে যে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মদীনা শরীফে একাধিক মসজিদ থাকা সত্ত্বেও মহিলারা উল্লিখিত বিশেষ কারণে শুধু মসজিদে নববীতে যাওয়ারই প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্য কোনো মসজিদে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মহিলাদের মসজিদে গমন-সংক্রান্ত হাদীসসমূহকে প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ আবু দাউদ শরীফে দুটি অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ১. باب ماجاء فى خروج النساء الى المسجد মহিলাদের মসজিদে গমন বৈধ কি না? ২. باب التشديد فى ذلك মহিলাদের মসজিদে গমনে কঠোরতা। (বযলুল মজহুদ ৪/১৬৪) এই দুই অধ্যায়ের প্রতি লক্ষ্য করলে মনে হয় যেন প্রথমটিতে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর হিসেবে দ্বিতীয় অধ্যায়টি লেখা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর সূত্রে একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, لا تمنعوا اماء الله مساجد الله "আল্লাহর বান্দিগণকে আল্লাহর মসজিদসমূহে আসতে নিষেধ করো না।" সেই একই সূত্রে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসে বলা হয়েছে لاتمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن "তোমাদের মহিলাগণকে মসজিদে যেতে বারণ করো না। তবে তাদের ঘর তাদের জন্য শ্রেয়।" অর্থাৎ তাদের নিজ গৃহে নামায আদায় মসজিদে নামায আদায় অপেক্ষা উত্তম। যেহেতু তাতে পর্দার পূর্ণতা রয়েছে। উক্ত হাদীসে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এখানে প্রথম বাক্যে মহিলাদের মসজিদে গমনে বাধা দিতে পুরুষদের নিষেধ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে ঘরে নামায আদায় করতে মহিলাদের উৎসাহিত করা হয়েছে। এটা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর আদর্শ শিক্ষাদান পদ্ধতির একটি উদাহরণ। যাতে মহিলাদের স্বামীর সাথে ঝগড়া-বিবাদও না হয় আবার মহিলাদের মসজিদে গমনও যেন বন্ধ হয়। দুই পক্ষকে দুই ধরনের নির্দেশ প্রদানের নজির আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। হাদীস ভাণ্ডারে নজর দিলে যার সন্ধান মেলে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) মহিলাদের মসজিদ গমনে কঠোরতা-সংক্রান্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, "যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদের এ সকল কর্মকাণ্ড দেখতেন তাহলে অবশ্যই তাদের মসজিদে গমণ করতে নিষেধ করতেন। যেভাবে বনী ইসরাঈলের মহিলাদের নিষেধ করা হয়েছিল।" এর পরের হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, মহিলাদের জন্য বারান্দায় নামায আদায় করার চেয়ে ঘরের ভেতর নামায আদায় করা উত্তম। আর ঘরের চেয়ে অন্দরমহলের ছোট্ট কুঠুরিতে নামায আদায় করা উত্তম। (আবু দাউদ)

উভয় ধরনের হাদীস দ্বারা যে শিক্ষা উম্মতকে দেওয়া হয়েছে তার সারকথা আবু দাউদ শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ বজলুল মজহুদে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। والفتوى اليوم على الكراهة فى الصلوات كلها لظهور الفساد "ফেতনা-ফাসাদের সয়লাবের কারণে সকল নামাযে মহিলাদের মসজিদে গমন মাকরূহ তথা নিষেধ।" (বজলুল মজহুদ ৪/১৬৫)

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) কর্তৃক এভাবে দুই ধরনের অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন করে মহিলাদের মসজিদে গমন-সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ করার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে কোয়ান্টাম কণিকায় শুধুমাত্র আবু দাউদ শরীফের প্রথম অধ্যায়ের ইবনে উমর (রা.)-এর প্রথম হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে। "তোমরা মহিলাদের মসজিদে যেতে বাধা দিও না।" (কোয়ান্টাম কণিকা পৃষ্ঠা ৩২০)

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটিকে বর্জন করা হয়েছে, যাতে উল্লেখ আছে যে, وبيوتهن خير لهن "তবে তাদের ঘর তাদের জন্য শ্রেয়।" আর আবু দাউদ শরীফের দ্বিতীয় অধ্যায়ের হাদীসের প্রতিতো ভ্রুক্ষেপই করা হয়নি। যার ভিত্তিতে মহিলাদের মসজিদে গমন নিষেধ করা হয়। এভাবে একটি বিষয়ের শুধু অংশ বিশেষ উল্লেখ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর মহিলাদের ঘর থেকে বের করার পথ মসৃণ করা হয়েছে। কোয়ান্টাম এভাবে মহিলাদের ঘর থেকে বের করে তাদের বিভিন্ন কোর্সে নিয়ে যাচ্ছে, মঞ্চে উপস্থিত করছে এবং দূর-দুরান্তের মহিলাদেরকে বান্দরবানের লামায় জমায়েত করে চলেছে।

হাদীসের এমন অপব্যাখ্যা করে, শরীয়তের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর পরিভাষা পরিবর্তন করে, ইসলামকে এক নতুন লেবাসে উপস্থাপন করার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। হাশরের ময়দানে দ্বীনের মাঝে এমন বিকৃতিকারীদেরকে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুহকান, সুহকান তথা দূর হও, দূর হও বলে তাড়িয়ে দেবেন। আর তারা কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হবে। অতএব এই পথে হেঁটে সফলতার চাবিকাঠি আদৌ কোয়ান্টিয়ার ভাইদের হস্তগত হবে কি না ভেবে দেখা উচিত।